ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন

এম শমশের আলী

ইসলাম
বিজ্ঞান
মেডিটেশন

এম শমশের আলী

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
www.quantummethod.org.bd

সূচিপত্র

॥ ৭ ॥
ভূমিকা

॥ ১১ ॥
দুঃখক্লিষ্ট মানুষের মনে শান্তির বাণী পৌঁছে দিয়েছে কোয়ান্টাম

॥ ১৪ ॥
আল্লাহ মানুষকে ধার্মিক হতে বলেছেন, ধর্মান্ধ নয়

॥ ১৭ ॥
কৃতজ্ঞচিত্ততাই কোয়ান্টামের মূল কথা

॥ ১৯ ॥
সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেবে জীবন

॥ ২৫ ॥
সুফিদের বিজ্ঞান ভাবনা

॥ ৪২ ॥
সমগ্র মানব সম্প্রদায় এক পরিবার

॥ ৫০ ॥
কোরআনের শিক্ষা মানুষকে আলোকিত জীবনের পথে পরিচালিত করে

॥ ৬১ ॥
কোনো মুসলমান সাম্প্রদায়িক হতে পারে না, সাম্প্রদায়িক লোক মুসলমান হতে পারে না

॥ ৭৩ ॥
আত্ম উন্নয়নের জন্যে চাই নিজেকে জানা

॥ ৮১ ॥
মন নিয়ন্ত্রণের বিশ্বজনীন প্রক্রিয়া কোয়ান্টাম মেথড

॥ ৯৪ ॥
শুদ্ধ নিয়ত কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করে

॥ ৯৯ ॥
রসুলের জীবনাদর্শ অনুসরণ ব্যক্তি ও সমাজকে সমৃদ্ধ করে

॥ ১০৮ ॥
বিশ্বমানের মানুষ হিসেবে তোমরা বেড়ে ওঠো

॥ ১১২ ॥
জ্ঞানী হও, পৃথিবীর পথে বেরিয়ে পড়ো

॥ ১১৬ ॥
ভবিষ্যতে মহাকাশ গবেষণায় নেতৃত্ব দিতে হবে

॥ ১২০ ॥
হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন করছে কোয়ান্টাম

॥ ১২৫ ॥
সৎকর্ম : মুক্তির পথ

প্রকাশকের কথা

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে খ্যাতিমান ও বরেণ্য বিজ্ঞানী ড. এম শমশের আলী। একাধারে তিনি শিক্ষাবিদ লেখক গবেষক ধর্মতাত্ত্বিক ও টিভি-ব্যক্তিত্ব। আমাদের দেশে গত কয়েক দশকে বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারে তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা আমরা সবাই জানি, বিশেষত পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র-তত্ত্বের অনবদ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং এর সাথে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম ও জীবনের বাস্তব ঘটনাগুলোর সাদৃশ্য তিনি সাধারণের সামনে উপস্থাপন করেছেন সহজ সাবলীল ভাষায়। এছাড়াও বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন ব্যাখ্যায় তার সুগভীর ও সহজাত পাণ্ডিত্য সর্বজনস্বীকৃত। এবং এর পাশাপাশি আন্তঃধর্মীয় ও সার্বজনীন সম্প্রীতি রচনার ক্ষেত্রে তিনি একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। সবমিলিয়ে বলা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুবিধ শাখায় তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ তাকে করে তুলেছে বিশিষ্ট ও অনন্য।

দুই দশক ধরে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় এই গুণীজন। স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনা করেছেন বিজ্ঞান ইসলাম মেডিটেশন আধ্যাত্মিকতাসহ নানা বিষয় এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে কোয়ান্টাম চেতনার উপযোগিতা নিয়ে। সেই সূত্রে ফাউন্ডেশনকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে, বিভিন্ন আঙ্গিকে। যার প্রমাণ মেলে তার বহুমাত্রিক আলোচনা ও কোয়ান্টাম বুলেটিনে দেয়া সাক্ষাৎকারে।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, পরম করুণাময়ের অনুগ্রহ আর কোয়ান্টামের প্রতি সদাস্নেহার্দ্র এ মানুষটির আন্তরিক সহযোগিতার ফলে আমরা তার বৈচিত্র্যঋদ্ধ আলোচনা ও সাক্ষাৎকারগুলো মলাটভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি, *ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন* বইটি আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠককে আলোকিত জীবনদৃষ্টি অর্জনে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করবে। প্রাণিত করবে ধ্যান, জ্ঞান ও মানবিকতার পথে এগিয়ে যেতে।

সবার সুস্বাস্থ্য, প্রশান্তি ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি।

ভূমিকা

কোয়ান্টামের প্রতি আমার আগ্রহ ও আকর্ষণ বহুদিনের। এর কারণ যে শুধু কোয়ান্টাম মেথডের কার্যকারিতা, তা নয়; এ মেথডটি প্রবর্তনের নেপথ্যে যে মানুষটি নীরবে নিঃশব্দে সবাইকে শারীরিক ও নৈতিক চালিকাশক্তি ব্যবহারের তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন, তাকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি। গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক বহুকাল ধরে গবেষণা করছেন–মন ও দেহ নামক গাড়িটিকে সুন্দরভাবে চালাতে হলে কী করে মানুষকে তার নিজের ড্রাইভিং সিটে বসতে হবে, তা নিয়ে। আর সেই কলাকৌশলটি তিনি সবাইকে শিখিয়ে চলেছেন কোয়ান্টাম মেথডের সাহায্যে।

আমাদের দেশের মানুষ ও পাশ্চাত্য জগতের মানুষের দুঃখকষ্ট একটু ভিন্ন রকমের। পাশ্চাত্যে জিনিসের কষ্ট নেই, মনের কষ্ট আছে। আর আমাদের অধিকাংশের মধ্যে মনের কষ্ট নেই, কিন্তু জিনিসের কষ্ট আছে। হালে অবশ্য কনজ্যুমারিজমের প্রভাবে আমাদেরও মনের কষ্ট বেড়ে চলেছে, এর ফলে নানারকম রোগও দেখা দিচ্ছে। এই রোগগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এগুলো যতটা না দেহের, তার চেয়ে বেশি মনের। এ কষ্ট দূর করতে তাই ওষুধের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন আছে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবার। প্রয়োজন আছে আত্মস্থ হবার। প্রয়োজন সঠিক ব্রেনওয়েভ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবার। কোয়ান্টাম এ কাজটিই সুচারুরূপে করে। আর তাই সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন–এটাই হওয়া চাই আমাদের সকলের আরাধ্য বিষয়।

এই পদ্ধতির সঙ্গে ইসলাম ও স্রষ্টায় ধ্যানমগ্নতার একটা সাযুজ্য আছে। আমিও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে গিয়ে আত্মবিকাশের পথে এ কথাগুলোই বিভিন্নভাবে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। কোয়ান্টাম আমার কথাগুলোই একসঙ্গে গেঁথে একটি গ্রন্থের রূপ দিয়েছে। এজন্যে আমি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কাছে এবং গুরুজী ও মা-জীর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এদের স্বপ্ন আমাকে নাড়া দিয়েছে। এ স্বপ্ন আকাশকুসুম কল্পনাকে ঘিরে নয়, বরং ধূলিধরার মানুষকে ঘিরে। লামাতে গিয়ে আমি এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের কিছু পরিচয় পেয়েছি। শতাব্দীর বঞ্চনা নিয়ে যে মানুষগুলো বাস করছিল একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে, সেখানে তাদেরকে মনুষ্যত্বের শীর্ষধাপে পৌঁছে দেয়ার যে নিরলস প্রচেষ্টা তারা করছেন, প্রকৃত অর্থেই তা স্রষ্টাসেবার কাজ।

স্রষ্টার প্রতি অগাধ বিশ্বাস রেখে আর মানুষকে দিয়ে মানুষের কল্যাণ সাধনের যে চেষ্টা কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন করে চলেছে, আমি তার সর্বাধিক সাফল্য কামনা করি।

এম শমশের আলী

দুঃখক্লিষ্ট মানুষের মনে শান্তির বাণী পৌঁছে দিয়েছে কোয়ান্টাম

'কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন' নামটাকে আমার কাছে খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। কোয়ান্টাম শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পরিমাণ। কিন্তু একজন পদার্থবিদ হিসেবে 'কোয়ান্টাম' শব্দের গুরুত্ব আমার কাছে আরো বেশি। কারণ দৃশ্যজগতে সবকিছু একই রকম হলেও বিজ্ঞানের চোখে বড় জিনিসের জগত আর ছোট জিনিসের জগত এক নয়। Laws of the small are different from the laws of the large.

যেমন, দৃশ্যজগতে শক্তিকে আমরা দেখি নিরবচ্ছিন্ন হিসেবে। কৌণিক ভরবেগ, এঙ্গুলার মোমেন্টাম–সবকিছুই নিরবচ্ছিন্ন। কিন্তু আমরা যদি ছোট জিনিসের জগতে যাই, তাহলে দেখব, সেখানে পদার্থের অণুরা যে গতি বিনিময় করছে তা নিরবচ্ছিন্ন নয়। থোকায় থোকায়, গুচ্ছে গুচ্ছে চলে এ শক্তি দেয়া-নেয়ার কাজ। আর এটাই কোয়ান্টাম মেকানিক্স।

এখন আমরা যদি আমাদের দেহের দিকে তাকাই, তবে দেখব, আমাদের সমস্ত চেতনার মূল হলো নিউরোন। এটি অতিসূক্ষ্ম। আর এ নিউরোনগুলো যে প্রক্রিয়ায় কাজ করে, তা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আওতায়ই পড়ে। সুতরাং 'কোয়ান্টাম' নাম দেয়াটা খুব যথার্থ হয়েছে। কারণ কোয়ান্টাম শেখায়, আত্মমগ্নতার মধ্য দিয়ে চেতনার গভীর থেকে একজন মানুষ কীভাবে পাবে তার অশান্তি, অসুস্থতা আর ব্যর্থতার বৃত্ত ভাঙার পথ। কোয়ান্টাম শেখায়, দেহ-মনের অফুরন্ত শক্তিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে কীভাবে একজন মানুষ তার কাজে লাগাতে পারে।

দুঃখক্লিষ্ট মানুষের মনে শান্তির বাণী পৌঁছানো, আত্মবিশ্বাস জোগানো– এটাই হলো তার জন্যে সবচেয়ে বড় সেবা। অর্থ দিয়ে এর কোনো পরিমাপ হয় না। গত ১৭ বছর ধরে নিরলস সেবার মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম এখন ৩০০ তম ব্যাচ সম্পন্ন করেছে। নিঃসন্দেহে এ এক মাইলফলক। কারণ মেডিটেশন কোর্সের মতো একটি বিষয়, যে-সম্পর্কে সাধারণ মানুষের তেমন কোনো

ধারণা ছিল না–এর ৩০০ তম কোর্স হওয়াটাই প্রমাণ করে, এ কোর্স মানুষের জীবনে কোথায় স্থান করে নিয়েছে। একজন এসেছে, উপকার পেয়েছে; তার বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়কে বলেছে, নিয়ে এসেছে তাকেও। এভাবেই তো এগিয়েছে কোয়ান্টাম চেতনা।

মোরাকাবা, তাফাক্কুর, ধ্যান, মেডিটেশন–এটা ইসলামের একটা উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। যেমন : নামাজ। মুসলমানদের দৈনন্দিন এ ফরজ ইবাদতটি আসলে ধ্যান এবং যোগাসনের একটি যুগপৎ উপযোগিতা। আমরা যখন নামাজ পড়ি, দুনিয়ার সমস্ত কোলাহল থেকে দূরে সরে গিয়ে নিবিষ্টচিত্তে স্রষ্টার কাছে আত্মনিবেদন করি। হয়তো স্রষ্টাকে দেখছি না, শুনছি না; কিন্তু তিনি আমাকে দেখছেন, আমাকে শুনছেন–এই যে নিবিষ্টচিত্তে কল্পনা আর একাগ্রচিত্ততা–এটাই তো ধ্যান।

একবার হযরত আলী (রা)-এর পায়ে তীর বিঁধল। প্রচণ্ড ব্যথায় তিনি কাতরাচ্ছেন। কয়েকজন সাহাবী তীর খুলতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তীরে হাত দিলেই আলী (রা) ব্যথায় চিৎকার করে ওঠেন। রসুল (স) বললেন, আলী যখন নামাজে সেজদায় যাবে তখন তীরটা খুলে নিও। কারণ নামাজে সে এতই নিমগ্ন থাকবে যে, ব্যথা কিছুই টের পাবে না। তা-ই হলো। আলী (রা) নামাজে দাঁড়ালেন। তীর খুলে নিলেন সাহাবীরা। তিনি টেরই পেলেন না।

মোবাইল ফোনের এ যুগে এক দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের আরেক দেশে সরাসরি কথা বলা, কথা শোনা খুব দৈনন্দিন একটি ব্যাপার। একসময় এটা যতই অকল্পনীয় ব্যাপার হোক না কেন, এখনকার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে আমরা জানছি যে, কলারের মোবাইল থেকে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল ট্রান্সমিট হচ্ছে। সেই সিগন্যালটা রিসিভড্ হচ্ছে রিসিভারের মোবাইলে। আর সেটা সম্ভব হচ্ছে কলার এবং রিসিভারের মধ্যে একটা বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে টিউনিং হচ্ছে বলে।

একইভাবে বান্দা যদি আল্লাহকে ডাকতে পারে, টিউনিংটা যদি ঠিকভাবে হয়, তখন স্রষ্টার সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে যায়। এজন্যে অলি-আউলিয়ারা ধ্যানের পরামর্শ দিয়ে গেছেন। নিবিষ্টচিত্তে যিনি ধ্যান করেন, তিনিই বুঝতে পারেন যে, কীভাবে ধ্যান করলে আল্লাহর সঙ্গে তার একটা সংযোগ হবে। এ যোগাযোগ বাইরের মানুষ টের পায় না। সে-রকম এই বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে–যিনি আমাদের প্রভু, যিনি আমাদের প্রতিপালক, যিনি আমাদের জীবনের সবকিছুর বিধায়ক–তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার একটি পদ্ধতি হচ্ছে ধ্যান।

নামাজে যোগাসন বা ব্যায়ামের উপকারিতাও আমরা লাভ করি। আমরা রুকুতে যাই, সেজদায় যাই, মাথা থেকে রক্ত চলাচল হয়। আমরা যখন আঙুলে গুনতে থাকি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ', তখন আমাদের হাতের আঙুলের কতগুলো পয়েন্টের যে কম্প্রেশন, তা রক্ত চলাচলকে স্বচ্ছন্দ করে। সুতরাং দৈহিক, আত্মিক, মানসিক–সবদিক দিয়ে নামাজ আমাদের উপকার করে। এভাবে ধ্যান থেকেও আমরা দৈহিক, মানসিক ও আত্মিকভাবে উপকৃত হই।

বিক্ষিপ্ততা আমাদের কাজের ক্ষমতা, দক্ষতা ও কার্যকারিতাকে ব্যাহত করে। অন্যদিকে কনসেনট্রেশন বা গভীর মনোনিবেশ আমাদের এনার্জি বা শক্তিকে ফোকাসিং করে এর সার্বিক কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে অনেক দুরূহ ও জটিল কাজও হয়ে যায় খুব সহজে। ধ্যান বা মেডিটেশনে মূলত এটিই হয়। বিশেষ একটি দিকে আমি আমার সমস্ত চিন্তাকে ধাবিত করছি–শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে এবং সে শক্তি দিয়ে সম্ভব হচ্ছে অনেক অভাবনীয় কাজ।

অর্থাৎ আল্লাহ একটা সিস্টেম দিয়েছেন, যদি বিশ্বাস জন্মে যে, এ সিস্টেমের কোনো ত্রুটি জয় করার ক্ষমতাও আল্লাহ দিয়েছেন, তাহলে কিন্তু আত্মবিশ্বাস বাড়ে। ধ্যান এই আত্মবিশ্বাসকে অসাধারণভাবে জাগিয়ে তোলে। মেডিটেশনের গুরুত্ব তাই অপরিসীম। মেডিটেশন মানুষকে শারীরিক এবং আত্মিকভাবে জাগ্রত করে, শক্তিশালী করে এবং তার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে।

কোয়ান্টাম মেথড ৩০০ তম কোর্সপূর্তির প্রাক্কালে নেয়া সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : রাবিয়া নাজরীন

আল্লাহ মানুষকে ধার্মিক হতে বলেছেন, ধর্মান্ধ নয়

পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে আমার পড়াশোনার শুরুটা বেশ মজার। বাবা আমাকে বলেছিলেন ইংরেজি আর গণিতে ডাবল অনার্স নিয়ে পড়তে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম যেদিন গেলাম, কৌতূহলবশত কার্জন হলে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে উঁকি দিচ্ছিলাম। ভেতর থেকে এক গুরুগম্ভীর হাঁক–'কী চাই? এদিকে আসো।' বললাম, কার্জন হলটা একটু ঘুরে দেখছিলাম।

বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছি শুনে তিনি আমার কাগজপত্র দেখতে চাইলেন। তারপর বললেন, কাল সকালেই এসে ফিজিক্সে ভর্তি হয়ে যাও। কথাটা তিনি এমন আদেশের সুরে বললেন যে, ইংরেজি আর গণিতে ডাবল অনার্স করার চিন্তাটা মাথা থেকে উবে গেল। পরে জেনেছি, তিনিই পদার্থবিজ্ঞানের খ্যাতনামা অধ্যাপক ড. ইন্নাস আলী।

পরের দিনই পদার্থবিজ্ঞানে ভর্তি হয়ে গেলাম। বাবাকে লিখে জানালাম–বিজ্ঞানের ভাষা যেহেতু গণিত, তাই পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়লে গণিত তো পড়া হবেই, আর ইংরেজি আমি নিজেই পড়ে নেব। সত্যিই তা-ই করেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্কলারশিপের টাকা পেয়েই শেলী, কীট্স, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিনে পড়তে শুরু করলাম।

একজন বিজ্ঞানী গণিতবিদ চিকিৎসক প্রকৌশলী সংগীতজ্ঞ খেলোয়াড়–সবাই যার যার পেশা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা নিজ নিজ অঙ্গনে জীবনটা কাটিয়ে দেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, জীবন আসলে অনেক বড়, অনেক ব্যাপক। অনেক কিছুর সমন্বয়েই একটা পরিপূর্ণ মানবজীবন। পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে এখানে মনুষ্যত্বের আরাধনা করতে হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গিই আমাকে জীবনের নানা পর্যায়ে একাধিক বিষয়ে উৎসাহী করে তুলেছে–পদার্থবিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম, সংগীত, খেলাধুলা।

প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাশাপাশি বিচিত্র বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠার পেছনে কয়েকজন শিক্ষকের উৎসাহ আমি পেয়েছিলাম। ড. কাজী মোতাহার

হোসেন তাদের অন্যতম। পরিসংখ্যানশাস্ত্র এদেশে যাদের হাত দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, তিনি তাদের একজন। ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও ছিল তার সুগভীর পাণ্ডিত্য। ভালো দাবা খেলতেন, টেনিস খেলতেন, গান গাইতেন। ছিলেন জাতীয় কবি নজরুলের একনিষ্ঠ বন্ধু। আমি তার খুব প্রিয় ছাত্র ছিলাম। খুব ভালবাসতেন আমাকে। আমার জীবনে তার অবদান অনেক।

আরেকজন মানুষের সাহচর্য আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি পাকিস্তানের নোবেলবিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালনায় স্রষ্টার যে প্রজ্ঞাপ্রসূত পরিকল্পনা–এর নানা দিক ও বিশ্লেষণ তিনি আমাকে বলতেন। বিভিন্ন সময়ে শোনা তার এ কথাগুলো আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। ইতালির ট্রিয়েস্টে-তে তার প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স (আইসিটিপি), এখন যেটি তার নামে নামকরণ করা হয়েছে, নানা গবেষণাকর্মের সূত্রে এ প্রতিষ্ঠানের সাথে ৪০ বছর ধরে আমার সম্পৃক্ততা ও নিয়মিত যাতায়াত।

এরকমই একবার আইসিটিপি-তে গেলাম। ১৯৭৮ সালের কথা। থাকি প্রফেসর গ্লাউকো ইয়েরেনেত্তি-র বাসায়। যেদিন ফিরে আসব–আমার ফ্লাইট ভোর পাঁচটায়। নাছোড়বান্দা ইয়েরেনেত্তি আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে।

সেদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজ পড়ছি, এমন সময় দেখি–রুমের আরেক পাশে ইয়েরেনেত্তি হাত তুলে প্রার্থনা করছে। যা-ই হোক, সে যথারীতি আমাকে পৌঁছে দিল। প্লেনে উঠে হঠাৎ মনে হলো–আচ্ছা, আমি মুসলমান, আমি কার কাছে হাত তুলছিলাম; আর ইয়েরেনেত্তি খ্রিষ্টান, সে কার কাছে হাত তুলছিল? একটা অদ্ভুত অনুভূতিময় শিহরণ হলো আমার!

সেদিন গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম–এক স্রষ্টার অধীনেই আমরা সবাই পরিচালিত হচ্ছি, মহাবিশ্বের সবকিছু একই নিয়মে চলছে। তাই আমরা সবাই যদি স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাস করি, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হই, মানুষকে ভালবাসি আর যার যার ধর্মের অমিল না খুঁজে মিলগুলো খুঁজে বের করি, তবে পৃথিবীটা সত্যিই একটা সুন্দর জায়গা হয়ে ওঠে। কারণ ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানগুলোই তো একমাত্র বিষয় নয়, বরং প্রত্যেক ধর্মের কল্যাণচেতনা আর নির্যাসটাই সবচেয়ে বড় কথা।

একসময় ইসলাম সম্পর্কে পড়তে গিয়ে বুঝলাম–এ এক অপূর্ব খনি। আমরা নৈতিক মূল্যবোধের কথা বলি; আর এ নৈতিকতার একটি বড় উৎস হলো ধর্ম। এছাড়াও ধর্মের ব্যাপারে ইসলামে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি